‘কৃষকের জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হবে কারণ তারা অনেক বড় প্রকৃতি বিজ্ঞানী’

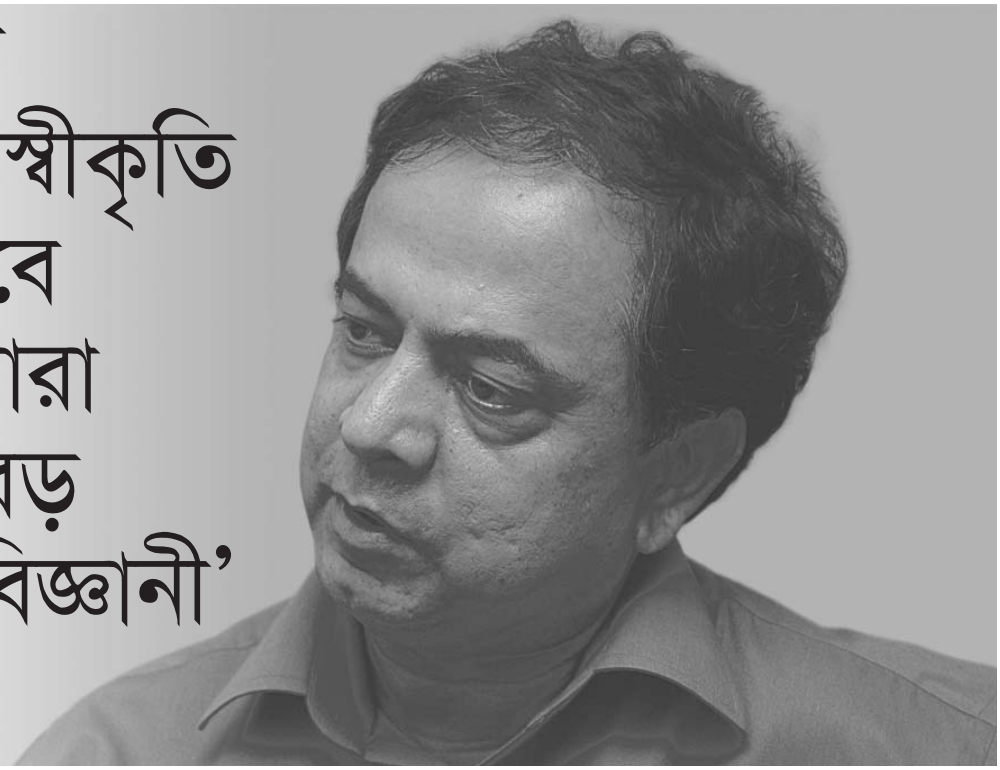

আবেদ চৌধুরী
জিন বিজ্ঞানী

বিশিষ্ট জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী স্বনামখ্যাত এই বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ‘র‍্যাক ডি’র মতো সুপারজিনের আবিষ্কারক। সম্প্রতি তিনি দেশে এসেছিলেন। ঘুরে গেছেন নিজ বাড়ি সিলেটের কানিহাটিতে। দেশজুড়ে বিশেষত গ্রামে-গঞ্জে বিজ্ঞান চেতনাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আয়োজন করেছেন বিজ্ঞান মেলা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি কথা বলেছেন তার গবেষণা, কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক নিয়ে... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জব্বার হোসেন** ও **হাসান মর্তাজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি তো ছিলেন কেমেস্ট্রিতে, সেখান থেকে বায়োলজিতে এলেন কীভাবে?

আবেদ চৌধুরী : আসলে কেমেস্ট্রি একটা জটিল বিষয়। প্রকৃতি থেকে আমি যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা আমাকে বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি যেহেতু ১০ বছর গ্রামে ছিলাম, তাই কৃষির বিষয়গুলো আমাকে আকর্ষণ করতো। প্রথমে মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করলাম। যাকে বলে অ্যাডভান্সড কেমেস্ট্রি এবং এর মাধ্যমে জীবিত বস্তুর যে রাসায়নিক গঠন তা নিয়ে ইউএসএতে পড়াশুনা করলাম। এ বিষয়গুলো যেমন খুবই জটিল, তেমনি সহজ। এভাবে আমি গ্রামের কৃষি, মাছ চাষের বিষয়গুলো খুঁজে পেলাম। বায়োডাইভার্সিটির পেছনে ছুটলাম। এভাবেই আস্তে আস্তে বায়োলজির দিকে চলে এলাম।

২০০০ : সেটা কোন সময়ের কথা?

আবেদ : প্রথমে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমেস্ট্রিতে পড়ে আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, সেখানে আমাকে বলল যে ইচ্ছা করলে বায়োলজি নিয়েও পড়তে পারি। এটা ছিল ওরিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মলিকুলার বায়োলজি। ওদের ধারণা যেকেউ এসে বায়োলজি পড়তে পারে। এমনকি আমাদের ওখানে ফিলোসফিরও কয়েকজন ছিল। এভাবে আমি কেমেস্ট্রিতে পড়েও বায়োলজিতে পিএইচডি করলাম।

২০০০ : আপনি তো ৮টি জিন আবিষ্কার করেছেন। এটা কি পিএইচডি করার সময়েই?

আবেদ : হ্যাঁ, ওটা আমি বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার ২ বছরের মধ্যেই করেছি।

২০০০ : তার মানে আপনি পুরোপুরি বায়োলজি পড়াশোনা করার আগেই জিন আবিষ্কার করেছেন?

আবেদ : অনেকটা সে রকমই। আসলে আমি বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করার তেমন সময় পাইনি। আমার শুধু এইচএসসি লেভেলে বায়োলজির জ্ঞান ছিল। আমার আবিস্কারকে ওরা বলেছিল ‘বিগিনার্স লাক’। মানে একজন মানুষ যখন নতুন কিছু শুরু করে তখন অনেক সময় বড় কিছু কাজ করে ফেলে।

২০০০ : যে জিনটি অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন যাবৎ আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিল, সেটি আপনি খুব অল্প সময়ে এবং বায়োলজি নিয়ে খুব কম পড়াশোনা করেই আবিষ্কার করে ফেললেন। এটি কি শুধুই ভাগ্য?

আবেদ : এর কারণ হলো ঐ সময়ে গবেষণাটা একেবারে আমার জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সব প্রেরণার উৎস হয়েছিল।

২০০০ : আপনি যে জিন নিয়ে কাজ করেন তা তো মানব জীন নয়, তা উদ্ভিদ জীন...

আবেদ : এ মুহূর্তে আমার যেসব গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা উদ্ভিদ জিন নিয়ে, কিন্তু আমার যে তত্ত্বটি নেচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল তা উদ্ভিদ-প্রাণী সব জিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিনোমের সুবিধা হলো এগুলো সবই ডিএনএ দিয়ে ধরি এবং একই রকম। আমি প্রথমে যে জিনটা আবিষ্কার করেছিলাম ‘র‍্যাক ডি’, এটা হলো ডিএনএ কীভাবে ভাঙে, জোড়া লাগে ঐ কাজটা যে জিন

করে সেই জিন। একে একটা সুপারজিন বলা যেতে পারে।

২০০০ : সুপার জিনের কাজ...

আবেদ : আমি যে জিনটি আবিষ্কার করলাম 'র‍্যাক ডি' এটি উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবার দেহেই আছে। কারণ ডিএনএ ভেঙে জোড়া লাগানো খুবই মৌলিক একটি বিষয়। এটি মানব দেহে আছে। এটি আসলে এক ধরনের দর্শন 'রিয়েলিটি অব লাইফ' সে সব কিছুই আসলে একই সত্ত্বা থেকে এসেছে। এই উপলব্ধিটা আমি গবেষণার মাধ্যমে পেয়েছি।

২০০০ : আপনার গবেষণার ধরন সম্পর্কে কিছু বলুন...

আবেদ : আমার সৌভাগ্য, আমেরিকার বিখ্যাত একটা গবেষণাগার এমআইটির বায়োলজি ল্যাবে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এর ফলে আমার জন্য জিন গবেষণা অনেক সহজ হয়ে যায়। ঐ সময় উদ্ভিদ জিন সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না। কাজেই আমি খুব অল্প সময়ে বেশ কয়েকটি জিন শনাক্ত করে ফেললাম। যেমন পরাগ কীভাবে তৈরি হয় সেই জিন। ৮টি জিন আসলে আমি ক্লোন করেছিলাম। কিন্তু শনাক্ত করেছি অনেক বেশি। গাছ উৎপাদনের জন্য যে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে তা কি পুরুষ এবং নারী উভয় বীজই দরকার, নাকি শুধু নারী বীজই দরকার- এ নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন সংশয় ছিল। বিষয়টি খুবই মজার। অন্যান্য প্রাণীতে একটি জাইগোট উৎপন্ন হয় (পুং ও স্ত্রী কেশর মিলে)। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুটি জাইগোট উৎপন্ন হয়। এর একটি জাইগোট গঠন করে ভ্রূণ, যা থেকে পরবর্তীতে চারা হয় এবং অপর জাইগোট গঠন করে শস্যদানা। যেমন চালের কথা যদি আমরা ধরি তাহলে দেখবেন চালের ভেতরের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ থেকে পরবর্তীতে নতুন চারা হয়, বাকি অংশ শুধু খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ অংশটা মোট চালের ৯০ শতাংশ এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম এন্ডোসফার্ম। আমি লক্ষ্য করলাম, ফুলের স্ত্রী অংশটুকু পুরোপুরি বীজে পরিণত হতে পারে না গুটিকয়েক বাধার কারণে। এবং এই বাধা দূর করে পুরুষ অংশ। এটা একটা মডেল। অন্য আরেকটা মডেল হলো পুরুষ অংশ অনেক কাজ করে। যদি বাধার মডেলটাই সত্যি হয় তাহলে ঐ বাধা কে সৃষ্টি করে, পুরুষ অংশ, নাকি স্ত্রী অংশ। তখন চিন্তা করলাম, ঐ বাধাগুলো যদি কৃত্রিম উপায়ে দূর করা যায় তাহলে একটি স্ত্রী স্তবক থেকেই একটি বীজ তৈরি সম্ভব। তখন জাইগোট থেকে পুংকেশর বাদ দিয়ে দিলাম। এটি করলাম মিউটেশনের মাধ্যমে। এমনিতেই স্ত্রী ফুল পুং ফুল রয়েছে, এদের পরাগায়ন ছাড়া ফল হয় না। কিন্তু ধান, গম এগুলো হলো উভয় লিঙ্গ ফুল। এরা প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই পরাগায়ন হয়ে যায় এবং বীজ হয়। কাজেই পোলেন বা পুংকেশর বাদ দেয়ার এই প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হলিক্রস কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে গ্রামের কৃষকের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের মানুষ। এই বিশাল বিভক্তি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। এটি ভারতেও আছে, পাকিস্তানেও আছে। কিন্তু পশ্চিমা দেশে কিন্তু কৃষকের ছেলের সঙ্গে শিল্পপতির ছেলের এতো পার্থক্য নেই

জটিল। তবে আমি যেহেতু জীন প্রকৌশল জানতাম, তাই জেনেটিক্যালি আমি সেটি করতে পেরেছিলাম। এটি ছিল ১৯৯৬ সালের কথা। ততদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ গবেষণার খবর ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সেমিনারে গিয়ে বলতে হচ্ছে আমার গবেষণার কথা। সবার মধ্যে একধরনের উত্তেজনা। পোলেন ছাড়া যদি বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহলে বীজ উৎপাদনে বিপ্লব সাধিত হবে। এভাবে সিড বায়োলজি নামে নতুন একটা ধারার জন্ম নেয়। আরো অনেক গবেষক এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। ততদিনে আমি এমআইটি থেকে অস্ট্রেলিয়া চলে এসেছি। কারণ এমআইটি ল্যাব খুব উন্নত হলেও বোস্টোনের আবহাওয়ায় গাছ উৎপন্ন হতে বেশ সমস্যা হয়। আর অস্ট্রেলিয়ান সরকারও বেশ সহযোগিতা করেছিল। ততদিনে ইউরোপের সঙ্গে বেশ ভালো একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল।

২০০০ : আপনি একোমিক্স প্রযুক্তির কথা বলছেন। এর বিশেষত্বটা কী?

আবেদ : বর্তমানে আমাদের দেশে হাইব্রিড ধান প্রচলিত রয়েছে এবং কৃষককে বারবার কোম্পানির কাছ থেকে বীজ কিনতে হয় বলে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এই অ্যাকোমিক্স প্রযুক্তিতে কৃষককে বারবার বীজ কিনতে হবে না। তারা নিজেরাই বীজ করতে পারবে যদি এমন হতো যে বীজ উৎপাদনে পুরুষ এবং স্ত্রী ফুলের সমান অংশগ্রহণ দরকার তাহলে কিন্তু এ কাজটি এতো সহজ হতো না। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী ফুল অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর অনেক সুবিধা রয়েছে। হাইব্রিড প্রযুক্তিতে কৃষক যখন ফসল উৎপাদন করে, তখন ঐ ফসলে সেই গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এটি কোম্পানির স্বার্থে ঐভাবেই তৈরি করা হয়। কিন্তু স্ত্রী ফুল থেকে উৎপাদিত বীজ কোম্পানির স্বার্থে নয় বরং তা কৃষকের স্বার্থে। কাজেই একে এমনভাবে তৈরি করা হবে, যাতে এর গুণাগুণ নষ্ট না হয়।

২০০০ : হাইব্রিড শস্য এবং অ্যাকোমিক্স শস্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

আবেদ : হাইব্রিড শস্যে একটি ফুল থেকে পুংকেশর আলাদা করে নেয়া হয় এবং অন্য একটি প্রজাতি থেকে পুংকেশর এনে আগের ফুলের স্ত্রী কেশরের সঙ্গে ক্রস করানো হয়। ফলে যে বীজ উৎপাদন হয় তাকে বলে S1 প্রজন্ম। ঐ বীজ থেকে যে শস্য উৎপাদন হবে সেই শস্যকে বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে তা হবে S2 প্রজন্মের। মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী S1-এ যে গুণাগুণ থাকবে তা S2 তে থাকবে না। যা এক-চতুর্থাংশ শস্যে কোনো বীজই থাকবে না, যা আমাদের দেশে দেখা গেছে। অনেক কৃষক S2 প্রজন্মের হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে সর্বস্বান্ত হয়েছে। অ্যামোটিক্স প্রযুক্তিতে কোনো পুং গ্যামেট ব্যবহার না করায় একই মাতৃফুল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় প্রজন্মান্তরে এর গুণাবলীতে কোনো পরিবর্তন হয় না। হাইব্রিডের মতো এখানেও ফুল থেকে পুংকেশর আলাদা করা হয় কিন্তু তা আর ক্রস করানো হয় না বলে এখানে মেন্ডেলের সূত্র কাজ করে না। আইআরআরআই-র সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে অ্যাকোমিক্স প্রযুক্তি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারবো এবং তখন উচ্চফলনশীল বীজ হাইব্রিড কোম্পানির হাত থেকে কৃষকের হাতে চলে যাবে।

২০০০ : আপনি গবেষণা করছেন বিদেশে। দেশে কি আমরা আপনার গবেষণা থেকে উপকৃত হতে পারি?

আবেদ : আমাদের দেশে যে সম্পদ রয়েছে তা দিয়েও আমরা বড় দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবো, যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। অনেক ছোট ছোট দেশ রয়েছে কোস্টারিকা, ইসরায়েল, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, তারা বুদ্ধিমানের মতো তাদের কৃষিকে উন্নত করেছে। কিন্তু আমাদের বেলায় বলা হচ্ছে আমাদের সুযোগ নেই। এটা আসলে সত্য নয়। বলা হয়, আমাদের সম্পদ নেই। জনসম্পদ বাইরে পাঠানো হচ্ছে। আসলে যারা আমাদের ব্যর্থতা চায় তারাই এটি ছড়াচ্ছে। এবং আমরা অশিক্ষিত নই, আমাদের উচিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা যে কেন আমাদের কৃষি উন্নত হচ্ছে না। আমাদের শীর্ষমহল যেমন প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ, ঠিক তেমনি প্রযুক্তি আমদানিতে অনীহা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনায় আমাদের নেতারা বিদেশী নেতাদের একটাই কথা বলে 'আমাদের

লোক নাও'। কিন্তু কখনই বলে না আমাদের লোকদের ট্রেনিং দাও যাতে তারা দেশে এসে ঐ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে। কৃষির ছাত্ররা সব অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, তাহলে দেশের কী হবে? দেশ কীভাবে চলবে? এভাবে আমাদের দেশের সব সম্পদ বিদেশে চলে যাবে এবং আমরা ক্রমাগত একটি শক্তিহীন জাতিতে পরিণত হবো। যে সম্পদ রয়েছে তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান রয়েছে তার ব্যবহার জানতে হবে।

২০০০ : প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞান রয়েছে বলছেন। একটু ব্যাখ্যা করবেন...

আবেদ : আমাদের কৃষকরা কিন্তু ঠিকই উন্নত জাতকে চিনতে পেরেছে এবং ধারাবাহিকভাবে এর উৎপাদন ধরে রেখেছে যেমন : কালিজিরা, চিনিগুড়া, রাঁধুনী পাগল জাতের ধান। কিন্তু আমরা তাদের বিজ্ঞানী বলি না; কারণ তারা আমাদের মতো তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। তার পরও তারা অনেক বেশি জানে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ এবং জনগণকে বুঝতে হবে, মডার্ন মলিকিউলার বায়োলজি এবং ল্যাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের বুঝতে হবে, হাজার বছর ধরে আমাদের কৃষকরা যা করছে সেটাও এক ধরনের বিজ্ঞান। কৃষকের জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হবে কারণ তারা অনেক বড় প্রকৃতি বিজ্ঞানী। তারা কোনো সূত্র জানে না। পরীক্ষা করার সুযোগ তাদের নেই। তার পরও তারা ফসলের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করেছে। অবাক করা বিষয় হলো হাজার বছর আগে কিন্তু কেউ লিখে রাখেনি, তারপরও প্রযুক্তি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। যেমন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, লাউ হচ্ছে মানুষের পোষ মানানো প্রথম উদ্ভিদ। এই লাউ তারা খেল, ডুগডুগি বানিয়ে গান গাইলো এবং তা দিয়ে পটারিও বানালো। এমনকি মাটি দিয়ে পটারি বানানোর আগেই তারা লাউয়ের পটারি বানিয়েছিল। প্রাচীন মানুষ লাউ নিয়ে আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় এল এবং এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় গেল। এটি একটি বিরাট আবিষ্কার এবং আধুনিক মলিকিউলার বায়োলজি ডিএনএ পরীক্ষা করে এটি আবিষ্কার করেছে। কৃষির জ্ঞান থেকে গান এসেছে। কেউ হয়তো বলবেন তারা কল্পনা করে গান গেয়েছেন, তা কিন্তু নয়। ভ্রমর এসে ফার্টিলাইজেশন ঘটাচ্ছে। এর ফলে নতুন জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে দেহতত্ত্ব রয়েছে, প্রেমতত্ত্ব রয়েছে। উদ্ভিদ জীবনের এই চক্রের সঙ্গে মানব জীবনতত্ত্বেও মিল রয়েছে, যা তারা ভ্রমরের এই আগমনকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন।

২০০০ : আমাদের কৃষকের এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে পশ্চিমা ল্যাব বিজ্ঞানের পাশে কি দাঁড় করানো হচ্ছে?

আবেদ : পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের একটি অংশ এই ন্যাচারাল হিস্ট্রি কিংবা এই বিবর্তনের বিষয়ে খুবই আগ্রহী। যেমন লাউয়ের এই আবিষ্কার তো পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের দ্বারাই হয়েছে। আমার এক সহকর্মী কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজান ম্যাককুচ, উনি বাংলাদেশী ৬ প্রজাতির ধানের ওপর অনেক গবেষণা করেছেন। অনেক পশ্চিমা বিজ্ঞানী এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বরং এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

২০০০ : আমরা বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে আছি কেন?

আবেদ : মূল কারণ বিজ্ঞানবিমুখতা। আমাদের দেশের প্রগতিশীল মানুষেরা মনে করে নাটক লেখা, গান করা, প্রগতিশীল কথা বলা হচ্ছে প্রগতিশীলতা। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রগতিশীলতা রয়েছে তা কেউ বোঝেও না, বলেও না। কিছুদিন আগে আমি একটি গ্রামের মাটির ঘরে দরজা লাগিয়ে জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখেছিলাম। অনুভব করার চেষ্টা করেছিলাম প্রকৃতিকে। এই কাজটি করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হলিক্রস কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে গ্রামের কৃষকের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের মানুষ। এই বিশাল বিভক্তি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। এটি ভারতেও আছে, পাকিস্তানেও আছে। কিন্তু পশ্চিমা দেশে কিন্তু কৃষকের ছেলের সঙ্গে শিল্পপতির ছেলের এতো পার্থক্য নেই। ৯০% মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটা তাদের হাতেই। বাকি ১০% মনে করে আমাদের বিজ্ঞান চর্চা মানেই হলো আমেরিকা যাওয়া। আমেরিকানরা কিন্তু আমার সঙ্গে আমার দেশের কৃষকের মধ্যে কোনো পার্থক্য খোঁজে না। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থাতেই পার্থক্য চলে আসছে। আমাদের দেশের মার্ক্সবাদীরাও কিন্তু এই পার্থক্য ঘোচাতে পারেনি। বরং তারাও এলিট শ্রেণীর মতো আচরণ করে।

২০০০ : আপনারা যারা বাইরে আছেন তাদের তো একটা ভূমিকা রয়েছে এ বিষয়ে...

আবেদ : আমি দেশে এসে অনেককে বলেছি। অন্যরাও দেশে এসে বলেছে এখন দেশের মানুষকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আমরা দরিদ্র জাতি নই, আমরা একটি সম্পদশালী জাতি। আমরা এমন একটি সম্পদশালী জাতি, যাদের সম্পদ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আমাদের দারিদ্র্য এখন মানসিক পর্যায়ে চলে গেছে। দেশের সম্পদ আমরা খোঁজ করি না। আমাদের দেশের ৯০% মানুষ যে মেধাবী, কর্মঠ তা আমরা খোঁজ করি না। তাদের নিয়ে আমরা শুধু স্লোগান দেই 'জনগণ জনগণ'।

২০০০ : একজন গবেষণাগারের বিজ্ঞানী এবং একজন ক্ষেতের কৃষকের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হবে কীভাবে?

আবেদ : আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। আমি নিজে দুবছর গ্রামে কাজ করেছি। গ্রামে বিজ্ঞান মেলা করেছি, সেখানে এলাকার এমপি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। আস্তে আস্তে সচেতনতা বাড়ছে। আমার এলাকার পূর্ব নাম কানিহাটি। কানিহাটি বিজ্ঞান মেলা নাম দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান করেছি। ঢাকা থেকে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি থেকে লোক গেল। লোকজ গান হয়েছিল। এভাবে গ্রামের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। গ্রামে গেলাম, ছবি তুললাম, চলে এলাম- তাতে হবে না। গিয়ে থাকতে হবে। প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। এভাবে শহর এবং গ্রামের গান-বিজ্ঞান পরস্পর কাছে আসতে থাকবে।

২০০০ : আপনি বলছিলেন আমাদের দেশে ৬ প্রজাতির ধান রয়েছে যা বাইরের কেউ জানেও না, আমরাও জানাইনি । এটা কেন?

আবেদ : এটা একটা ঐতিহাসিক অজ্ঞতা। ধানের নাম বললেই দেখবেন 'ইন্ডিকা' এবং 'জাপানিকা' প্রজাতি। আগে বলা হতো, আমাদের আউশ-আমন ইন্ডিকা প্রজাতির, পরে দেখা গেল তা না। এখন বলা হচ্ছে আউশ-আমন- বোরো কমপ্লেক্স। তার মানে এই যে, আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, যেমন 'লাঠিশাইল' উচ্চফলশীল ধানের আদি জননী। ষাটের দশকে যখন সবুজ বিপ্লব হয়, তখন ইরি ৪ এবং ৮ এই দুই প্রকার ধানের যে ক্রসের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল তখন বাংলাদেশের

কৃষির জ্ঞান থেকে গান এসেছে। কেউ হয়তো বলবেন তারা কল্পনা করে গান গেয়েছেন, তা কিন্তু নয়। ভ্রমর এসে ফার্টিলাইজেশন ঘটাচ্ছে। এর ফলে নতুন জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে দেহতত্ত্ব রয়েছে, প্রেমতত্ত্ব রয়েছে। উদ্ভিদ জীবনের এই চক্রের সঙ্গে মানব জীবনতত্ত্বেও মিল রয়েছে, যা তারা ভ্রমরের এই আগমনকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন

একটি ধান ব্যবহার করা হয়েছিল, এটি হলো সেই লাঠিশাইল। সিলেটিরা এক বলে 'লাঠিআইল' আমেরিকায় গিয়ে আমি এই লাঠিশাইল দেখলাম উচ্চফলনশীল ধান হিসেবে। এবার ফিলিপাইনে যখন ধান গবেষণা কেন্দ্রে রাইস কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে গিয়েছিলাম। সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাইস ব্রিডার গুরুদেব খুস, যিনি একজন আমেরিকায় প্রবাসী পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে দেখা হয়। সবুজ বিপ্লব থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় উচ্চফলনশীল ধান উনি ব্রিড করেছেন। গুরুদেব যখন আমাকে ওনার বইটি দিলেন, তখন দেখলাম প্রথমেই বলা হয়েছে আমাদের লাঠিশাইলের কথা। কাজেই এই যে আমরা বলি উফশী খারাপ। উফশীতে তো আমাদের ধানও রয়েছে। এটা কিন্তু আমাদের অনেকেই জানে না। এটা সবার জানা উচিত বিশেষ করে মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী, নাট্যকর্মী, মেধাবী ছাত্রদের । আরেকটা ধান আছে 'কাছালত'। এটা নিয়ে এখন বেশ মাতামাতি চলছে, কারণ জাপানিরা এটা নিয়ে অনেক কাজ করেছে, অনেক জিন আবিষ্কার করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত। আমাদের ধান নিয়ে জাপানিরা গবেষণা করে লাভবান হবে, আমাদের কিছু দেবে না তা তো হবে না। এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কথা বলা উচিত এবং বললে জাপানিরা আমাদেরও কিছু লভাংশ দেবে। কিংবা চেষ্টা করলে এসব কাজ আমাদের দেশেও করা সম্ভব।

২০০০ : আপনি অস্ট্রেলিয়ায় যে গবেষণা করছেন সেটা কি বাংলাদেশে করা সম্ভব?

আবেদ : আমি ওখানে যে আঙ্গিকে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যত বাজেটে কাজ করছি, এখানে হয়তো তা করা কঠিন। কিন্তু আমি মনে করি দেশে একটি মলিকিউলার বায়োলজি ল্যাব হওয়া উচিত। আমাদের এই যে হাজার জাতের ধান, এর ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট করে রাখতে হবে, যাতে অন্য কেউ এই ধান নিয়ে গেলে আমরা বলতে পারব এটি আমাদের। অথচ বর্তমানে আমাদের কোনো ধানের ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই। এর জন্য যে অনেক টাকা দরকার তাও না। আর আমাদের দেশে যে উঁচু উঁচু বিল্ডিং হচ্ছে, এর এক ভাগ টাকা দিয়ে এসব করা সম্ভব। দেশে এসে আমি চেষ্টা করেছি বিদেশী প্রযুক্তি সম্পর্কে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে। এমনকি মাদ্রাসায় গিয়েও আমি ছাত্রদের জেনেটিক্সের বই পড়িয়েছি। সবাই বলে গ্রাম নাকি মৌলবাদে পূর্ণ হয়ে গেছে। এটা আসলে ঠিক নয়। বরং উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তরা, গ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের উচিত আমাদের কৃষিকে এবং মৎস্যকে কেন্দ্র করে গ্রামে যাওয়া।

২০০০ : এই যে আমরা কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই বিদেশী কোম্পানির শরণাপন্ন হচ্ছি, মাঠের শস্যের বদলে গবেষণাগারজাত শস্যের দিকে ঝুঁকছি। এর কী কোনো বিকল্প আছে?

আবেদ : বিকল্প হলো, দুটোই ব্যবহার করতে হবে। ল্যাবের শস্য মানেই যে খারাপ, তা কিন্তু নয়। হাইব্রিডে সমস্যা হলো কৃষককে কোম্পানির শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু চীনে বিজ্ঞানীরা কমিউনিটিগুলোকে হাইব্রিড শস্য উৎপাদনের কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে। কাজেই তারা আর কোম্পানিগুলোর কাছে যাচ্ছে না। তেমনিভাবে আমাদের গ্রামের কৃষকদেরও হাইব্রিড উৎপাদন শেখাতে হবে। আবার বন্যা কিংবা খরার পরে যে ধান উৎপাদন হয় তা বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয় না। এ বিষয়টি যদি কৃষক না জানে, তাহলে ফলন স্বাভাবিকভাবেই খারাপ হবে। কিন্তু তারা যদি কিছু টাকা খরচ করে বীজ কিনে বপন করতো তাহলে আর এ সমস্যা হতো না।

২০০০ : ভারত এবং চীন। এরা একদিকে যেমন শিল্পে উন্নতি করছে অপরদিকে তেমনি কৃষিতেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। অথচ আমরা পারছি না। এ তিনটি দেশের তুলনামূলক চিত্রটা একটু আলোচনা করুন।

আবেদ : ভারত একটি বিশাল দেশ। পাঞ্জাব, লুধিয়ানা ইত্যাদি প্রদেশ আগে থেকেই কৃষিতে বেশ উন্নত। সে তুলনায় বিহার কম। পাঞ্জাবে কৃষি খামারের আকারও বড় বড়। ওখানকার কৃষকের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আরো উন্নত উপায়ে খামার করে। শহরে আসে না। আমাদের দেশে কীভাবে যেন একটা গ্রামভীতি ঢুকে গেছে। এমনকি আমাদের দেশের নাটকেও দেখবেন গ্রামের মানুষ বোকা। সেখানে ঝাড়ফুঁক চলে ইত্যাদি। এ কারণে গ্রামের একটা সাধারণ ছেলে শহরে এসে আর ফিরে যায় না। এটি কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা। শুধু টাকা পয়সা এ জন্য দায়ী নয়।

আবার চীনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, মাওবাদী বিপ্লবের পর সেখানের সমাজব্যবস্থা পাল্টে গেছে। সেখানে কৃষকের ক্ষমতায়ন হয়েছে। আর আমাদের দেশে শেরাটন হোটেলে কৃষি নিয়ে, সারের ভর্তুকি নিয়ে আলোচনা হয়। স্যুটপরা লোকজন আলোচনায় অংশ নেন অথচ তাদের কৃষির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ আমাদের কৃষক সেখানে যেতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকের সঙ্গে ক্ষমতাবান শ্রেণীর এই যে বিরাট দূরত্ব, এ জন্যই আমাদের দেশ পিছিয়ে আছে। ভারতে রাজনীতিবিদ বা নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। আমি একজন নাট্যকারকে বলেছিলাম, আপনি এমন একটি নাটক তৈরি করুন যেখানে দেখানো হবে একজন শিক্ষিত ছেলে কৃষিকাজ করে। কিন্তু তিনি তা করেননি।

আমাদের ধান নিয়ে জাপানিরা গবেষণা করে লাভবান হবে, আমাদের কিছু দেবে না তা তো হবে না। এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে কথা বলা উচিত এবং বললে জাপানিরা আমাদেরও কিছু লভাংশ দেবে। কিংবা চেষ্টা করলে এসব কাজ আমাদের দেশেও করা সম্ভব

২০০০ : '৭৯ সালে দেশের বাইরে চলে গেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেমন বাংলাদেশ আপনি দেখতে চান?

আবেদ : আমি খুব সম্পদশালী একটা বাংলাদেশ দেখতে চাই। কারণ বিদেশে আমি দেখেছি আমাদের দেশের ছেলেরা একটু সুযোগ পেলেই তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। এ কারণে আমার মনে হয়, আমরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারি।

২০০০ : বিজ্ঞান গবেষণায় কোনো দর্শন বা চিন্তা কি আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

আবেদ : হ্যাঁ, ডেভিড লুক নামের এক ভদ্রলোক আছেন যিনি একজন জেনেটিক বিজ্ঞানী। এখন তিনি পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন। এক ধরনের বিজ্ঞানকেন্দ্রিক দর্শনের চর্চা করেন। আমি যেহেতু প্রকৃতির মাধ্যমে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করি তাই তার চিন্তা-চেতনা আমাকে প্রভাবিত করেছে। এ রকম আরো অনেকে আছে যেমন লাইনাস পল বলে একজন আছেন যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এ জন্যে আমেরিকান সরকার তাঁর পাসপোর্ট ভিসা সব জব্দ করেছে। উনি ওরিগনের লোক ছিলেন। উনি একজন প্রগতিশীল বিজ্ঞানী। এ ধরনের প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের দেখে আমি উৎসাহিত হই। আমি দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ওখানে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। একই সঙ্গে অফিসার এবং পিয়ন বসে খাবার খাচ্ছে। কেউ কিছু মনে করে না। বরং আমাদের দেশে এ জিনিস কাগজে-কলমে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই।

অনুলিখন : **মাহমুদ রাজু**
ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**